১.

প্রায় দুঃস্বপ্নমাখা এক রাত্রি; যেখানে ভয়, ঘৃণা, অপ্রাকৃত রহস্য মিশে আছে। দেখতে পাই এক কুষ্ঠরোগী হাইড্র্যান্টের জল চেটে খাচ্ছে। রাত্রির নির্জনতা ভেঙে ছুটে যাচ্ছে মোটরগাড়ি, রিক্সা। শোনা যাচ্ছে এক ইহুদী নারীর গান। পথে হেঁটে চলেছে ফিরিঙ্গি যুককেরা। বেন্টিক স্ট্রীট, টেরিটিবাজার জুড়ে আছে বাণিজ্যিক পরিমণ্ডল। আছে হৃদয়হীন লেনদেন। রাত্রির অন্ধকারে এমন নগরী আরণ্যক রূপ পেয়েছে দেখা যায়।

প্রাথমিকভাবে 'রাত্রি' কবিতা পড়লে আমরা এমনই এক স্বস্তিহীন পরিবেশের সম্মুখীন হই। কবিতাটিতে দু'জন দ্রষ্টা আছে। স্বয়ং কবি এবং এক বুড়ো নিগ্রো। এই দু'জনের চোখে রাত্রির কলকাতাকে আমরা দেখি। সাধারণভাবে রাত্রি সম্পর্কে আমাদের ধারণা দু'রকম—উপভোগের অথবা আতঙ্কের। রাত্রির দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রহরে যোগী ও ভোগীরা জাগে, আমরা জানি। কিন্তু এখানে আমরা দেখি এক অনশ্বরের চিত্রমালা। কুষ্ঠরোগীর জল চেটে খাওয়ার পাশেই ছুটে যায় মোটরকার, রিক্সা; আবার তা অদৃশ্য হয়েও যায়। বাতাস চীনেবাদামের মতো শুকনো; বাণিজ্যিক লেনদেনে মানবিকতার স্থান নেই। ফলে মানুষ আর মানুষ থাকে না। ক্রমাগত যান্ত্রিক জীবন যাপনে উজ্জ্বল নগরীও হয়ে যায় জঙ্গলের অন্ধকারে ভরা।

সাধারণভাবে রাত্রিকে আমরা রহস্যময় রূপেই দেখি। রাত্রির গোপন আঁধারে এমন অনেক কিছু ঘটে যায়, যা দিবালোকে ভাবা যায় না। এই দুঃস্বপ্নময় রাত্রির আরো একটি রূপ আছে—যা ধ্যানমগ্ন, শান্ত, স্নিগ্ধ। শেলি যে অর্থে রাত্রির গভীরে প্রসন্ন ভোরকে লক্ষ্য করেন, সেই রাত্রি শুভদা, বরদা। কিন্তু এখানে একঝলক কবিতাটি পড়লেই ভিতরে ভিতরে শঙ্কা জেগে ওঠে। এই রাত্রির রূপ চেনা, তবু বিষম অচেনা মনে হয়। এখানে মোটরকার গাড়লের মতো কাশে; গ্যাস ল্যাম্পে রিক্সা মিশে যায়; ইহুদী রমণী গান গায়; লোল নিগ্রো হাসে। রাত্রির বাতাস চীনেবাদামের মতো শুক্‌নো, খস্‌খসে। সব মিলেয়ে এক অপ্রাকৃত অথচ প্রাকৃত রাত্রি। ভাবি, কী বলতে চান কবি? বিভীষিকা, ঘৃণা আর হতাশা জাগানোই কি তাঁর উদ্দেশ্য? প্রাথমিকভাবে 'রাত্রি' কবিতাপাঠে আমরা এক অনভ্যস্ত অন্ধকারে ও নিশাচর জীবনের মুখোমুখি হই, যেখানে মৈত্রেয়ীর ভূমাবোধ নেই; আত্তিলার দুঃশাসন রূপ আছে।

২.

জীবনানন্দের 'রাত্রি' কবিতাটির গভীরে প্রবেশের আগে আমরা রবীন্দ্রনাথের 'রাত্রি' (দ্র. 'নবজাতক' কাব্য) কবিতাটির কথা প্রসঙ্গত বলতে চাই। কেননা, চির-আস্তিক্যবাদী রবীন্দ্রনাথ অন্ধকারের মধ্যে আলো, রাত্রির ভিতরে সূর্যোদয় কল্পনা করেছেন। অথচ এখানে রাত্রি তাঁর চোখে মায়াবিনী, মোহময়ী। 'দিবসের রাজদণ্ড' কেড়ে নিয়ে মানুষকে সে কামান্ধ ও দিগ্‌ভ্রান্ত করে। যদিও কবিতার শেষে কবি প্রাণপণে আলোর বন্দনা করে বলেছেন—'আমি কর্তা আমি মুক্ত, দিবসের আলোকে দীক্ষিত।' অর্থাৎ মানুষের 'বড় আমি' কখনোই রাত্রির প্ররোচনায় প্রলুব্ধ হয় না। জীবনানন্দ কিন্তু এতখানি কল্পচারী নন। সরাসরি তিনি প্রত্যক্ষ জগৎকে রূপময় করেছেন।

'রাত্রি' শব্দটির অর্থ : 'রাতি অভীষ্টম্ ইতি রাত্রিঃ' যিনি অভীষ্ট সিদ্ধ করেন। কী এই অভীষ্ট? যাতে জাগতিক সুখ, বিলাস পূর্ণ হয়; অথবা মহত্তর ইচ্ছা পূর্ণ হয়। মার্কণ্ডেয় চণ্ডী পড়লে আমরা দেখতে পাই, রাত্রি দু'রকম—জীব রাত্রি আর ঈশ্বর রাত্রি। প্রথমটি মায়া-মোহময়; দ্বিতীয়টি

চৈতন্যময়। তাই 'রাত্রি সূক্তে' বলা হয়েছে, 'রাত্রিস্তোমং ন জিগ্যুষে'। রাত্রির আঁধার সত্য নয়, তাকে জয় করতে হবে। কিন্তু সাধ ও সাধ্যের মধ্যে সর্বদা সেতু রচনা হয় না। জীবনানন্দের কবিতায় সাধ ও সাধ্যের প্রতারক কোনো ছবি নেই। আছে এক ভয়ংকর সত্যের, বাস্তবের সম্মুখীন হওয়া। সর্বত্র তিনি লক্ষ্য করেন পরাভব আর মানুষের অমানুষ হওয়ার বেদনাময় আলেখ্য—

হাইড্র্যান্ট খুলে দিয়ে কুষ্ঠরোগী চেটে নেয় জল;
অথবা সে-হাইড্র্যান্ট হয়তো বা গিয়েছিল ফেঁসে।

এক জুগুপ্সাময় চিত্র; তৃষ্ণার এক মর্মান্তিক দাহ। এই তৃষ্ণা তথাগতর 'তন্‌হা' নয়; বড় বেশি ঔদারিক। কিন্তু নর্দমার জল কেন? তৃষ্ণা বা ক্ষুধা তেমন প্রবল হলে কোনো বাছবিচার, কাণ্ডজ্ঞান থাকে না; মানুষে-পশুতে ভেদ থাকে না। ড্রেন কি কলের জল ভাবার অবকাশ থাকে না; তাই আকারে মানুষ অ-মানুষ হয়ে যায়। নর্দমার জলপানে তৃষ্ণা মেটায়। সঙ্গে সঙ্গে মনে হয়, এখানে তৃষ্ণা বা পিপাসা বোধহয় শুধু ঔদারিক নয়; দেহেরও পিপাসা। চিকিৎসা শাস্ত্র পড়ে জানা যায় কুষ্ঠরোগীরা নানা বিকারের শিকার হয়। কামের প্রবলতা তাদের বেশি; তাই জলের তৃষ্ণা, দেহের তৃষ্ণা এখানে সমার্থক। গোটা সমাজ, মানব সমাজই কবির চোখে যেন 'কুষ্ঠরোগী'; যারা বিকারের ঘোরে মানবিক সুস্থতাও হারিয়ে ফেলেছে। 'হাইড্র্যান্ট' সেই ক্বাথময় জীবনপ্রণালী, যা এইসব বিকারগ্রস্তদের ডাক দেয়। তাই তার 'ফেঁসে' যাওয়া। অর্থাৎ কুষ্ঠরোগীরা দু'ভাবে ঐ নর্দমার জলকে ব্যবহার করেছে। কেউ তৃষ্ণাতুর হয়ে ছুটে গেছে; কারো কাছে বা নর্দমা উপ্‌ছে জল এসেছে মুখের কাছে। মালিন্যের এই বিস্তার নগর সভ্যতার বিকৃতিকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়। এমন নগরীতে রাত্রি নামে 'দল বেঁধে।' রাত্রির দস্যুরূপ ঐ দলবাঁধার শব্দবন্ধে ধরা পড়েছে। গুণ্ডা-ডাকাতের মতো রাত্রিও অভিসন্ধি নিয়ে নেমে আসে। প্রসঙ্গত প্রথম যৌবনে রবীন্দ্রনাথের লেখা 'নামে সন্ধ্যা তন্দ্রলসা/সোনার আঁচলখসা' চিত্রকল্পটির কথা বলতে পারি। এই রোমান্টিকতার মুগ্ধতা জীবনানন্দ ছিঁড়ে ফেলেছেন। রাত্রি রহস্যময়ী নয়; ছলনাময়ী। এমন বর্বর রাত্রিতে তাই 'একটি মোটরকার গাড়লের মতো গেল কেশে' সংগত মনে হয়। পেট্রলের গন্ধকে কাশি বা কফের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে; যান্ত্রিকতার বোধহীনতা অব্যর্থভাবে একাত্ম হয়েছে গাড়লের সঙ্গে। দ্বিতীয় স্তবকে চিত্রিত হয়েছে তিনটি রিকশ—যা অলৌকিকভাবে গ্যাসল্যাম্পে মিশে গেছে 'মায়াবীর মতো জাদুবলে'। এই দেখা স্যুররিয়ালিষ্ট; তাই মোটরকার গাড়ল হয়ে যায়; রিকশাগুলি অদৃশ্য হয়ে যায়। কিন্তু কেন? এই নগরজীবন ও নগরসভ্যতা তার করালগ্রাস মেলে ধরেছে; তাই সব কিছু সেখানে ধ্বংস হয়। যন্ত্র-সভ্যতার দাপটে শ্রমজীবী মানুষ নষ্ট হচ্ছে; মোটরকার এসে রিকশাকে সরিয়ে দিচ্ছে নিপুণভাবে। কবি কি এভাবেই সভ্যতার হৃদয়হীন রূপ দেখেছেন? একদিকে কুষ্ঠরোগী, অন্যদিকে যন্ত্র-সভ্যতার ছবি— জীবিতের অস্তিত্ব বিপন্ন। তাই কবি লেখেন—

সতত সতর্ক থেকে তবু
কেউ যেন ভয়াবহভাবে পড়ে গেছে জলে।

এই সমাজে, এই নগরে ও এমন রাত্রে সতর্কতাও অর্থহীন। অতিসভ্য ও প্রগতিক হওয়ার নেশা সচেতন মানুষকে বিপন্ন করে; যা জলে পড়ার মতো এক অসহায় অবস্থা।

নাগরিক জীবনযাত্রায় কবি খুশি বা তৃপ্ত নন। তৃতীয় স্তবকে মাইল মাইল পথ হেঁটে কবি দেখতে পান বণিকসভ্যতার রূঢ়মূর্তি। ফিয়ার লেন ছেড়ে, বেন্টিঙ্ক স্ট্রীট বা টেরিটিবাজারে গিয়ে 'চীনেবাদামের মতো বিশুষ্ক বাতাসে' কবিপ্রাণ কষ্ট পায়। কলকাতার এইসব অঞ্চল পণ্যকেন্দ্র; এখানে লেনদেন ছাড়া মানবিক সম্পর্ক নেই। নীরস চীনেবাদাম ও তার শক্ত খোসা সেই পণ্যসর্বস্ব-রূপকে ইঙ্গিত করেছে; যার অভ্যন্তরে প্রবেশ করা সুসাধ্য নয়। এই নাগর-সভ্যতায় জীবন-ধনুকের ছিলা টান্‌টান্ থাকে শুধু অর্থে, কামে, লোভে—'মদির আলোর তাপ চুমো খায় গালে';

যেন এক বারাঙ্গনা অর্থের বিনিময়ে ভালোবাসা জানাচ্ছে; উষ্ণতা দিচ্ছে। রাত্রির অন্ধকার, নিঃসঙ্গ কবি আর ঐ মদির আলো রচনা করেছে স্থূল কামনার পরিমণ্ডল। বাণিজ্যের নানা পসরা 'কেরোসিন, কাঠ, গালা, গুণচট, চামড়ার ঘ্রাণ' আর ডায়নামোর গর্জন রাত্রির কলকাতাকে, বিশেষ কয়েকটি অঞ্চলকে অমানবিক করে তুলেছে। পঞ্চম স্তবকের শুরুতেই তাই কবির বক্তব্য : 'টান রাখে মৃত ও জাগ্রত পৃথিবীকে।' অর্থলুব্ধ সমাজ ও মানুষ সংস্কৃতিহীন, শ্রীহীন; তাই মৃত। আর ঐ অর্থ-ই সচল রেখেছে জগৎকে। রাত্রির কলকাতা, সহসা কবির চোখে 'পৃথিবী'র রূপকল্প হয়ে গেছে। যে পৃথিবী পণ্যে, অর্থে সচল, সজীব; অথচ মানবিকতা, প্রেম যেখানে মৃত। তবুও সবাই চায় সুখ, অর্থ, বেঁচে থাকার স্বাদ। অন্যকে বঞ্চিত করেও মানুষ চায় নিজের সুখ-সমৃদ্ধি। এই ঐহিকতার মূর্ত প্রতীক আত্তিলা; পরমার্থের কথা যারা বলে, তারা উপহসিত হয়।

শ্লোক আওড়ায়ে গেছে মৈত্রেয়ী কবে;
রাজ্য জয় ক'রে গেছে অমর আত্তিলা।

যে মৈত্রেয়ী অমৃতই কাম্য বলেছিলেন, তাঁর কথা ব্যর্থ হয়েছে এ যুগে। বরং হুণরাজ অ্যাটিলা, একালের হিট্‌লাররা পশুশক্তি নিয়ে জনগণপূজ্য হয়ে উঠেছে দেখা যায়। ইতিহাসের সেই আশ্চর্য পরিহাস কবি লক্ষ্য করেছেন।

'তবু' এই অব্যয় প্রয়োগে কবি ব্যক্ত করেন তাঁর আশা, ভালোবাসা। ষষ্ঠ স্তবকের শুরুটি এইরকম—

নিতান্ত নিজের সুরে তবুও তো উপরের জানালার থেকে
গান গায় আধো জেগে ইহুদী রমণী;

রাত্রির কলকাতা যেখানে দুস্যতায়, কামনায়, বাণিজ্যে ক্লিন্ন; সেখানেই কিন্তু নগরসভ্যতা শেষ হয়ে যায় নি। নরকের পরে আছে স্বর্গ; বাণিজ্য গল্পের পরে আছে গান। যে গানের সুর ধার করা বা কৃত্রিম নয়; 'নিতান্ত নিজের সুরে' গান গেয়েছে আধো জাগা ইহুদী রমণী। গানের ব্যাকরণ না মেনে হৃদয়ের ইশারাকে এই নারী মান্য করেছে; তার গান তাই ভালোবাসার গান অনুমান করা যায়। কিন্তু কেন সে গাইছে? কবি বলেছেন, নারীটি আধোজাগা; এই জাগরণে ঘুমে মেশা রূপ তো বিরহিণী প্রেমিকার। এই নারী ইহুদী; পেশায় হয়ত সে বারাঙ্গনা। তবু এই হৃদয়হীন সভ্যতায় সে ক্লান্তিবোধ করেছে বোঝা যায়। তাই নিজের মধ্যে নিজে সে ডুব দিয়েছে। অথচ এই পণ্যভিত্তিক সমাজে প্রেম, গান হাস্যকর। তাই 'পিতৃলোক হেসে ভাবে, কাকে বলে গান'। ইহুদী নারী (কিংবা বারাঙ্গনা) হলেও তার অন্তরে যে প্রেমিকা নারী থাকতে পারে, মাংসলোভী পুরুষ বা সমাজ বিশ্বাস করে না। তারা সোনা, তেল, কাগজের খনির পাশেই গান ও প্রেমকে সমমূল্য দেয়। অথবা এমনও হতে পারে, ইহুদী নারীর গানে আকৃষ্ট হয়ে যে পুরুষ আসবে, তার সঙ্গে মিলনে জন্ম নেবে সন্তান। তাই 'পিতৃলোক' শব্দটি ব্যবহৃত; যাঁরা পিণ্ডপ্রত্যাশী। কিন্তু এমন পরিবেশে কাম আছে, সন্তান-কামনার বিশুদ্ধতা নেই। তাই যে গান প্রেমের ও মিলনের, তা শুনে পিতৃলোক হাসে; ভাবে, এই গানও বাণিজ্য বায়ুতে মিশে যাবে। রাত্রিচর পুরুষের আনাগোনা ঠিক পরের স্তবকেই দেখি—'ফিরিঙ্গি যুবক ক'টি চ'লে যায় ছিমছাম।' তাদের নৈশাভিসার দেখে বিগতযৌবন ব্যর্থকাম 'এক লোল নিগ্রো হাসে'। তার হাসিটি বড় করুণ; কেননা তার মনে কামনা আছে, চরিতার্থ করার সামর্থ্য নেই। এতই অশক্ত সে যে, নিজে দাঁড়াতেও পারে না। 'থামে ঠেস দিয়ে' সে দাঁড়ায়। অথবা এমনও ভাবা যায়, সে জীবনের উপান্তে এসে বুঝেছে, জীবনে বসন্ত ক্ষণস্থায়ী; তাই মত্ত, নিশাচর ফিরিঙ্গি যুবাদের যৌবন-শিকার দেখে সে হেসেছে। আপাতত জীবনের তাপ সে খুঁজে পেয়েছে 'ব্রায়ার পাইপ'-এ; ধূমপানে। যৌনতার বিকল্প হয়েছে তামাক। তবে 'বুড়ো এক গরিলার মতন বিশ্বাসে' পংক্তিটি দুরূহ। গরিলার বিশ্বাস-অবিশ্বাস কি, তাও ব্যাখ্যাযোগ্য নয়। যদিও ডারুইনের তত্ত্বানুসারে গরিলা, বানর হলো মানুষের পূর্বজ। সভ্য ও অসভ্য রূপের ঠিক মধ্যবর্তী স্তরে দাঁড়িয়ে আছে গরিলা; যার বুদ্ধি ও আচরণ মানুষের মতো,

তবু মানুষের মতো নয়। তাই বুড়ো নিগ্রো একই সঙ্গে আসক্ত, দ্রষ্টা ও অনাসক্ত। নিগ্রো ও গরিলার বাহ্য আকৃতির মিল দেখানো কবির একমাত্র লক্ষ্য, এমন মনে হয় না। বরং আদিম সভ্যতার, আরণ্য জীবনের মধ্যে যে সরলতা, অকৃত্রিমতা ও মুক্তি আছে, তাকেই যেন কবি দ্যোতিত করেন 'গরিলার মতন বিশ্বাসে' কথাগুলির মধ্যে। আজকের এই আত্মরতিময় জগতে, বাণিজ্যে, যৌনতায় ডুবে থাকা মানুষের সমাজে হৃদয় নেই, বিশ্বাস নেই, বিশুদ্ধতা নেই। হাতের ব্রায়ার পাইপ পরিষ্কার করে বুড়ো নিগ্রোটি যেন অবরুদ্ধ মালিন্য, গ্লানিকে মুছে দিতে চায়। তামাকের পাইপ ক্লেদাক্ত, মদির সমাজের প্রতীক বলে মনে হয়। যেখানে কবি প্রত্যাশা করেন গরিলার বিশ্বাস; আড়াল দেওয়া সভ্যতার বিকার নয়, নগ্ন বর্বরতা বরং অধিক কাম্য।

অষ্টম স্তবকটি এই কারণে উল্লেখযোগ্য। চারিদিকে যেখানে অর্থ, কাম ও পণ্যের বিস্তার, সেখানে রাত্রিও ভোগীর দখলে চলে যায়। 'মহৎ' বিশেষণে সেই ব্যঙ্গ কবি করতে চান, রাত্রিকে যারা মহৎ ভাবে তা কত ভ্রান্ত। এখানে 'তার মনে হয়' বাক্যটির 'তার' কে? কবি? নাকি ঐ লোল নিগ্রো? দুজনেই হতে পারে। কবি তো আগাগোড়া দ্রষ্টা ও পথিক। তার সঙ্গে মিশেছে আফ্রিকান মানুষটির দৃষ্টিভঙ্গিও। গরিলার বিশ্বাস তার আছে বলেই আদিম আরণ্যজীবনকে এই মহানগরীতে সে মূর্ত দেখে। তার চোখে কলকাতার রাত্রি 'লিবিয়ার জঙ্গলের মতো।' আর মানুষেরা জন্তুমাত্র।

তবুও জন্তুগুলো আনুপূর্ব—অতিবৈতনিক,
বস্তুত কাপড় পরে লজ্জাবশত।

যে সভ্যতা অন্তঃসার শূন্য, বিকার গ্রস্ত, সেই আড়াল রচনার জন্য ব্যস্ত হয়। সেই মুখোশপরা সভ্যতাই লজ্জায় কাপড় পরে। অথবা এটুকু বিবেক, মনুষ্যত্ব আছে বলে নগরীর মানুষেরা লজ্জা বোধ করে। যে লজ্জাবোধের মধ্যে নিহিত আছে তিমির-বিনাশের ইচ্ছা। তাই রাত্রির কলকাতা লিবিয়ার জঙ্গল* হয়েও সম্পূর্ণ আদিম হয়ে ওঠে নি।

৩.

আটটি স্তবকে, বত্রিশ পংক্তিতে লেখা 'রাত্রি' কবিতাটি অক্ষরবৃত্তে লেখা। প্রতিটি স্তবক চারটি চরণে গঠিত; তবে মিল বিন্যাসে প্রথম ও তৃতীয় পংক্তি অন্ত্যমিল হীন। শুধু দ্বিতীয় ও চতুর্থ পংক্তির মধ্যে মিল রাখা হয়েছে। চতুর্থ পংক্তিটি আবার সব স্তবকে সমান মাপের নয়। দ্বিতীয়, চতুর্থ ও অষ্টম স্তবকের চতুর্থ পংক্তিগুলি হ্রস্বাকার। এছাড়া মাত্রাভাগেও কবি সতর্ক নন। মুখ্যত কবি আঠারো মাত্রার মহাপয়ারে কবিতাটি লিখতে চেয়েছেন। পর্বভাগ করেছেন ৮+১০ এইভাবে। কিন্তু মাঝে মাঝে তার ব্যতিক্রমও ঘটেছে। যেমন, তৃতীয় স্তবকের তৃতীয় পংক্তিটি—দাঁড়ালাম বেন্টিঙ্ক স্ট্রীটে গিয়ে—টেরিটি বাজারে; এখানে 'দাঁড়ালাম'-কে অতিপর্বে না ধরলে মাত্রাগণনা করা যায় না। চতুর্থ স্তবকের তৃতীয় পংক্তিটিতে পনের মাত্রা ব্যবহৃত হয়েছে—'ডাইনামোর গুঞ্জনের সাথে মিশে গিয়ে'। এখানে পর্বভাগ করতে হলে নয় মাত্রার পরে ভাগ করতে হয়; যা অক্ষরবৃত্তের রীতি অনুসারী নয়। একই রকম মাত্রাবিন্যাস হয়েছে সপ্তম স্তবকে 'হাতের ব্রায়ার পাইপ পরিষ্কার ক'রে' এই পংক্তিতে। অষ্টম স্তবকে 'নগরীর মহৎ রাত্রিকে

---

* "সম্ভবত জীবনানন্দের কাছে লিবিয়ার 'দু'রকম অর্থ ছিল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ চলাকালীন লিবিয়ার বালুভূমিতে জার্মান সেনাপতি রোমেলের সঙ্গে লড়াই চলছিল ব্রিটিশ সেনাপতি মন্টগোমারির। ফলে যে-কোনো বাঙালী কবিতা পাঠকের কাছে লিবিয়া নামটা অপরিচিত ছিল না। অন্যদিকে, শেক্সপীয়র পাঠে স্নিগ্ধরুচি জীবনানন্দের কাছে লিবিয়া শব্দটি উত্তর আফ্রিকার 'মূর' প্রতীক হিসেবে এসেছে। আবার ধ্রুপদী-ইউরোপীয় সাহিত্যে কার্থেজ—ঐ লিবিয়ারই অঙ্গ, যার মহাবীর হানিবল সভ্য রোম ধ্বংস করতে গিয়েছিল। আবার ভার্জিলের ইনিয়স্ কার্থেজের যে বিধবা রানী দিদোর প্রেমে পড়েছিলেন, যে দিদো ইনিয়সের চলে যাওয়ার দুঃখে কার্থেজও জ্বালিয়ে দিয়েছেন, নিজেও আত্মঘাতী হয়েছেন। আসলে জীবনানন্দ—লিবিয়ার জঙ্গল বলতে সম্ভবত এতসব ইতিহাসের অন্তর্গত মূল বিষয় যা কেবলমাত্র মৃত্যু ও ধ্বংসের কথাই বলে, অমরত্ব নয়, সেটুকুই তুলে ধরতে চেয়েছেন।" [রাত্রি/তরুণ সান্যাল/"কবিতার অভিষঙ্গ" কার্তিক, ১৩৯৮]

তার মনে হয়' পংক্তির পর্ববিভাগও ছন্দের ব্যাকরণ মানে না। অনুরূপ ভাবে 'তবুও জন্তুগুলো আনুপূর্ব—অতিবৈতনিক' পংক্তিতে পর্ববিন্যাস সুসমমাত্রিক নয়। উভয় পংক্তিতে 'নগরী'র এবং 'তবুও'-কে যদি অতিপর্ব ধরা হয়, তবেই অক্ষরবৃত্ত ছন্দ রূপে পড়তে অসুবিধা হয় না। 'রাত্রি' কবিতার ছন্দ-রূপ-দেখে মনে হয়, কবি কাব্যশিল্পের প্রতি তেমন মনোযোগী ছিলেন না।

উপমাকে কবিত্বের নিদর্শন বলেছিলেন জীবনানন্দ। কাজেই তাঁর কবিতায় উপমা, চিত্রকল্পের ব্যবহার সংগত ভাবেই থাকবে, ধরা যায়। 'একটি দুপুর রাত নগরীতে দল বেঁধে নামে' এই চিত্রকল্পটি সহজেই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। মধ্যরাত্রির গম্ভীর নিঃশব্দ রূপ অনেক কবিই এঁকেছেন; কিন্তু দলবেঁধে দস্যু বা ছিনতাইকারীর মতো রাত্রি নামার চিত্রটি আমাদের সচকিত করে। বুঝতে পারি, কবি রাত্রির প্ররোচনাময়, জুগুপ্সার ও ভয়ার্তরূপের দিকটি আমাদের সামনে হাজির করতে চান। এরই পাশে সংগতিপূর্ণ হয়ে ওঠে বেন্টিঙ্ক স্ট্রীট বা টেরিটি বাজারের 'চীনেবাদামের মতো বিশুষ্ক বাতাসে' চিত্রকল্প বা উপমাটি। যে বাতাসে স্নিগ্ধতা, সজলতা নেই, তা কতখানি খরস্পর্শী তা ঐ চীনেবাদামের সঙ্গে তুলনায় স্পষ্ট হয়েছে। বাদামের খোলা ভাঙলে বাদাম বা শাঁস পাই। কিন্তু বাণিজ্যভিত্তিক, পণ্যমনস্ক সমাজে শাঁসের হাতছানি ও ছলনা থাকলেও, শেষ পর্যন্ত লাভের ঘরে শূন্যতা বা খোসাই থাকে।

সমাসোক্তি অলংকারের ব্যবহারও এই কবিতায় তাৎপর্যপূর্ণ হয়েছে। 'মদির আলোর তাপ চুমো খায় গালে' পড়ামাত্র আমরা চমকে উঠি। মদির আলো এক মদালসা পণ্যনারী ছাড়া আর কিছু নয়, এই রাত্রির অন্ধকারে তার তাপ যৌনতার ইঙ্গিতে ভরা, বুঝে নিতে অসুবিধা হয় না। কবির বিবমিষা স্পষ্ট হয়েছে নগরীর রাত্রিকে 'লিবিয়ার জঙ্গলের মতো' তুলনায়। জনারণ্যময় শহর শেষপর্যন্ত জান্তব, আরণ্যক হয়েছে—যা কবির কাছে বেদনাদায়ক।

শব্দ ব্যবহারেও নতুনত্ব লক্ষণীয়। ফেঁসে, দল বেঁধে, গাড়লের মতো, আওড়ায়ে ইত্যাকার লৌকিক শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। কবিতা বলতেই যাঁরা সাধুশব্দের সাধুরূপের কথা ভাবেন, কবি তাঁদের নিরাশ করেছেন। অথচ শব্দগুলির প্রয়োগ যে অব্যর্থ, এতে সন্দেহ নেই। পাশাপাশি তৎসম শব্দও সমান তাৎপর্যে ব্যবহৃত—সতত সতর্ক, মদির, শ্লোক, পিতৃলোক, লোল, আনুপূর্ব, অতিবৈতনিক ইত্যাদি। ইংরাজি শব্দ—হাইড্র্যান্ট, রিক্‌শ, পেট্রল, মাইল, ডাইনামো, ব্রায়ার পাইপ ইত্যাদিও সার্থকভাবে ব্যবহার করা হয়েছে। রাত্রির যে অন্ধকার রূপ, যে হৃদয়হীন পণ্য রূপ কবির চোখে ধরা পড়েছে, এইসব বিচিত্র শব্দ ব্যবহারে তার প্রকাশ তীব্র হয়েছে। যুগের কলুষে দূষিত রাত্রি মিশ্র শব্দের সমাহারে জীবন্ত হয়ে উঠেছে।

৪.

শেষ পর্যন্ত 'রাত্রি' কবিতাটি আমাদের কাছে এক মহানগরীর রিরংসাময়, ক্লেদাক্ত, বাণিজ্যিক রূপ প্রকাশ করেছে। এই রাত্রির মদির মায়ায় নষ্ট হয় শহরের বিশুদ্ধতা; মানবচরিত্র। যান্ত্রিক সভ্যতার করালগ্রাসে ধ্বংস হয় কায়িক শ্রম, সন্তান ধারণের আনন্দ, প্রেম ও প্রতীক্ষা। মৈত্রেয়ী ও আত্তিলা—এই দুই বিপরীত চরিত্রের নামে জীবন-ধনুকের ছিলা টান্ হয়ে থাকে; অথচ জ্যা-মুক্ত শর কাকে বিদ্ধ করতে চায়, জানা নেই। সেই দিগ্‌ভ্রান্ত জীবনের রূপ 'রাত্রি' কবিতায় মূর্ত হয়েছে। তবু কবির অন্তরস্থ আশা একেবারে মরে নি। মানুষকে তিনি ক্লীব, জন্তুরূপেই দেখতে চান নি। কবিতার অন্তিম পংক্তিতে 'লজ্জা' শব্দের ব্যবহারে মানুষকে পুনরায় সুস্থরূপে দেখেছেন; রচনা করেছেন তমসাবৃতা রাত্রির রাত্রি-জয়ের নতুন সূক্ত।